ইনস্টিটিউট অফ গভর্নেন্স স্টাডিজ

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

জানুয়ারি ২০০৮

জবাবদিহিতামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের নীতিমালা সিরিজ

দুর্নীতি দমন কমিশন: সংস্কার সুপারিশ

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তৃতি এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে। দুর্নীতি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা বিনষ্ট করে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা খাতের উন্নয়নের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, গণতন্ত্রকে দুর্বল ও আইনের শাসনকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে। দুর্নীতি বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রের দ্বারপ্রান্তে টেনে আনে। সাবেক দুর্নীতি দমন ব্যুরো (Bureau of Anti-Corruption) দুর্নীতির রাশ টেনে ধরতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ২০০৪ সালের ২১ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন (Anti-Corruption Commission)ও অকার্যকর ছিল।[১]

তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাজনৈতিক সংকল্প, সদিচ্ছা এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগঠিত করেছে। সরকার নতুন নেতৃত্বকে কমিশনের দায়িত্ব প্রদান, মামলার তদন্ত ও বিচার কাজ পরিচালনার জন্য নতুনভাবে অর্থ বরাদ্দ ও লোকবল সংগঠিত করে। সাম্প্রতিককালে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বহু তদন্তের সূচনা এবং শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিক ও সরকারি কর্মকর্তাদের বিচার পরিচালনার কাজও শুরু করে।

ইনস্টিটিউট অফ গভর্নেন্স স্টাডিজ (আইজিএস) মনে করে যে, দুর্নীতি দমনের জন্য উপযুক্ত সংস্কার নীতিমালার বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক। দুর্নীতি দমন কমিশনকে তার উপর নির্দেশিত কার্য-সম্পাদনের লক্ষ্যে শক্তিশালী করা এবং দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করার জন্য কমিশন, সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষ/প্রতিষ্ঠানসমূহের নিম্নোক্ত ৪টি বিষয়ের প্রতি জরুরিভাবে মনোনিবেশ করা দরকার।

প্রথমত: জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনকে অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও ব্যক্তি পর্যায়ের প্রভাব থেকে মুক্ত এবং স্বাধীন হতে হবে।

দ্বিতীয়ত: সরকারের জবাবদিহিতা বাড়ানোর জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনকে অবশ্যই দায়বদ্ধ হতে হবে।

তৃতীয়ত: দুর্নীতি দমন কৌশল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নে কমিশনকে অবশ্যই সফল হতে হবে, এবং জনগণের বিশ্বাস অর্জনের জন্য একে কার্যকর করতে হবে।

চতুর্থত: দুর্নীতি দমন কমিশনের সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং টেকসই হওয়ার জন্য কমিশনকে অবশ্যই দক্ষ হতে হবে।

আইজিএস মে ২০০৭ -এ একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করে, যার লক্ষ্য ছিল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত প্রশাসনিক ও ব্যবহারিক সুপারিশমালা প্রণয়ন করা।[২] উক্ত কর্মশালার আলোচনা এবং উল্লিখিত ৪টি প্রসঙ্গের আলোকে[৩] এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, যেন প্রস্তাবনাটি *দুদকের* সংস্কারের ব্যাপারে অবদান রাখতে পারে। কমিশনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কি হতে পারে তা-ও এই নীতিমালায় আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রস্তাবিত নীতিমালায় প্রতিটি নীতি ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি তা প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলীর বিষয়েও দিক্-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এই প্রস্তাবনা প্রণয়নকারীদের অভিমত এই যে, দুর্নীতি দমন বিষয়ক নীতিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা না হলে অতীতের মত ভবিষ্যতেও বাংলাদেশে দুর্নীতি দমবন্ধ করা অবস্থার সৃষ্টি করবে।[৪] সুপারিশসমূহ স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন বিষয়ক সংস্কার কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত নীতিনির্ধারক ও প্রয়োগকারীদের কাছে এই সুপারিশমালা একটি "রোড ম্যাপ" হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

www.igs-bracu.ac.bd

২০০৫ সনে বেসরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স স্টাডিজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের প্রত্যাশিত উন্নয়নের লক্ষ্যে নেতৃত্ব বিকাশের প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে পেশাগত অগ্রগতির আলোকে জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে ছাত্রদের ঋদ্ধ করতে মানসম্মত ও বিস্তৃত শিক্ষাদানের মানসে ২০০১ সনে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য: সমাজের প্রয়োজন বিবেচনায় উচ্চশিক্ষায় উৎকর্ষ সাধনের উপযোগী একটি কেন্দ্র তৈরীর মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা – যা হবে ব্র্যাকের সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন-উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

Institute of Governance Studies
House No. 40/6, North Avenue, Gulshan 2, Dhaka-1212, Bangladesh
Tel : + 88 01199 810380, +88 02 8810306, 8810320, 8810326
Fax : + 88 02 8832542; Email: igs-info@bracuniversity.ac.bd
www. igs-bracu.ac.bd

স্বাধীনতা

দুর্নীতি দমন কমিশনকে অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত করে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর মাধ্যমে বাজেট প্রণয়ন, কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশনকে আরো ক্ষমতা প্রদান করা প্রয়োজন। দুর্নীতি দমন ব্যুরো-র অভিমত থেকে জানা যায় যে, স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারার দরুন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যুরোর পদক্ষেপসমূহ ফলপ্রসূ হয়নি। দুর্নীতি দমন ব্যুরো প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকায় কার্যতঃ তার স্বাধীনতা খর্ব হয়। তবে, দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতার অর্থ এমন হতে হবে যেন এর কার্যাবলী কোন অবস্থায়ই উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিংবা অসাবধানতা বশতঃ কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী দ্বারা প্রভাবিত না হয়।

সুপারিশ: অর্থনৈতিক বিষয় ও কার্য-সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের শাসন বিভাগ থেকে স্বাধীন হওয়ার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন সংশোধন করা প্রয়োজন। কমিশনের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য যে সকল আইনী নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও দিক্-নির্দেশনামূলক বিধি-বিধান আছে, সেগুলো পুনর্মূল্যায়ন ও নতুনভাবে প্রণয়ন করে সংশোধনী আনতে হবে।

স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য একটি স্থায়ী অর্থ প্রাপ্তির উৎস সৃষ্টি করতে হবে। জাতীয় সংসদ বছরের শুরুতে কমিশনকে দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবহারের জন্য একটি থোক বরাদ্দ দিতে পারে, তবে প্রকৃত বরাদ্দ সংসদে আলোচনার পর বাৎসরিক বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য সরকারি নিরীক্ষা থেকে মুক্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। একটি নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ দ্বারা নিয়মিত হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে এমন বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যাতে বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপ কমানো সম্ভব হয়। বিশেষত উচ্চতর আদালত কর্তৃক প্রদত্ত স্থগিতাদেশ সীমিত করার বিধান রাখা যেতে পারে।

দুদক কমিশনারদের কার্যকাল সুরক্ষার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে সাংবিধানিক সংশোধনী আনা যেতে পারে। যেমন:

- ধারা ১০ (যাতে কমিশনারদের কার্যকাল বিষয়ে সাংবিধানিক বিধান উল্লেখিত আছে)।
- ধারা ২৪ ও ২৫ (যা অন্যান্য বিধান ও সরকারি দপ্তর কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্ম সম্পাদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে)।
- ধারা ৩৪ (যার দরুন দুর্নীতি দমন কমিশনের নিয়ম-কানুন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়)।

দুর্নীতি দমন কমিশনে সরাসরি লোকবল নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যতদিন পর্যন্ত সরকারি কর্ম কমিশন সংস্কার করে এর কর্ম-পরিধি সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব না হয়, ততদিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বহাল রাখা যেতে পারে। *দুদকের* বিচার সংক্রান্ত ইউনিটটি আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে চুক্তি ভিত্তিতে ও প্রতিযোগিতামূলক ভাতা প্রদানের মাধ্যমে আইনজ্ঞদের নিয়োগ প্রদান করে কমিশনের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ আইনজীবী টীম গঠন করা যেতে পারে। কমিশন কর্মীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদির বিষয় পুনর্বিবেচনা করা এবং সৃজনশীল কিছু ধারণা (উদাহরণ স্বরূপ, সফলভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত কোনো ব্যক্তির বিচার কাজ পরিচালনা করতে পারা একজন কর্মীর ভবিষ্যত পদোন্নতির জন্য কৃতিত্ব হিসেবে বিবেচিত হতে পারে) বাস্তবায়ন করা, যা কমিশনের কর্মীদের যথাযথ আইনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে আপোষ না করে আরও দক্ষভাবে কাজ করতে উৎসাহিত করবে।

মধ্যমেয়াদী পদক্ষেপ

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের বাছাই কমিটি ভারসাম্যপূর্ণ করা প্রয়োজন। কমিশনের নেতাদের যোগ্যতা অবশ্যই মেধার ভিত্তিতে নিরূপিত হওয়া উচিত।

অন্য দু'জন কমিশনার নিয়োগের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কমিশনের চেয়ারম্যানের অংশগ্রহণ থাকা প্রয়োজন। এর ফলে একটি উদ্যমী টীম গঠনের মাধ্যমে কাজের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হবে। একটি জাতীয় বাছাই কমিটি (national search committee)র সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে বাছাই কমিটি ও কমিশনের নেতৃত্বের যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করা যেতে পারে।

বাছাই কমিটি গঠন ও কমিশনের নেতৃত্ব মনোনয়ন– উভয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য জনগণের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য অধিবেশন হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেখানে জনগণ দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন, অংশগ্রহণকারী হিসেবে নয়। (যদি বাংলাদেশে এ ধরনের প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠান অসম্ভব বলে মনে হয়, বিকল্প হিসেবে, জন-সচেতনতা ও জন-বিতর্ক তৈরির জন্য মনোনীতদের নাম গণমাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে।)

৩জন কমিশনারের নিয়োগ এমনভাবে বিন্যস্ত করা প্রয়োজন যাতে তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ধারাবাহিকতা বজায় থকে। সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশন নেতৃবর্গকে অভিশংসন ও অপসারণ করার বিধান রাখা প্রয়োজন।

দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ

মহাহিসাব নিরীক্ষকের দপ্তর, ন্যায়পালের দপ্তর, নির্বাচন কমিশন, এবং সরকারি কর্ম কমিশন ইত্যাদি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মতো দুর্নীতি দমন কমিশনকেও সম-মর্যাদা প্রদান করা প্রয়োজন। এজন্য জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে সংবিধানে সংশোধনী আনতে হবে।

জবাবদিহিতা

*দুদক*কে বাংলাদেশের নাগরিকদের কাছে দায়বদ্ধ হতে হবে। যেসকল কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এই জবাবদিহিতা সৃষ্টি হতে পারে সেগুলি হচ্ছে: কমিশনের সকল কাজ স্বচ্ছতার সঙ্গে করা, অর্থ ব্যবস্থাপনা ও কর্মচারী পরিচালনায় কঠোর নৈতিকতার মানদণ্ড প্রয়োগ করা, কমিশনের আইন-কানুন ও নৈতিকতার বিষয়াবলী প্রচার করা, কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা। দুর্নীতি দমন ব্যুরো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কাছে দায়বদ্ধ এবং এর স্বচ্ছতারও অভাব ছিল। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বের সরকারের শাসনামলেও দুর্নীতি দমন কমিশন দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা তৈরীতে ব্যর্থ হয়। তখন কমিশনের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রচার করা হতো না এবং অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতার জন্য কোন আনুষ্ঠানিক প্রশাসনিক কাঠামোও ছিল না।

সুপারিশ: দুর্নীতি দমন কমিশনের জবাবদিহিতার জন্য বর্তমানে বাহ্যিক জবাবদিহিতার যে কাঠামো আছে তা আরো কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একইসাথে কমিশনের দায়বদ্ধতার জন্য অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতার নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। স্বচ্ছতার স্বার্থে দুর্নীতি দমন কমিশনে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ প্রয়োজন, প্রকারান্তরে যা জবাবদিহিতা বাড়াবে।

স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ

দুর্নীতি দমন কমিশনের আইন ও বিধিমালায় এর বার্ষিক প্রতিবেদনের রূপরেখা ও বিষয়বস্তু কেমন হবে তা সংযোজন করতে হবে। এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি সরাসরি সংসদের স্পীকারের কাছে প্রেরণ করা প্রয়োজন। এছাড়া এই প্রতিবেদন ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, সংবাদপত্র, সাময়িকী, বেতার, টেলিভিশন তথা গণমাধ্যমে প্রচার করতে হবে।

কমিশনে নিদেনপক্ষে একজন কমিশনারের অধীনে একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে যা নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে:

- দুর্নীতি দমন কমিশন আইন অনুসারে বিধি-বিধান এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতার নীতি নির্ধারণ করা যা *দুদকের* প্রতিদিনের কার্য-সম্পাদনে সহায়ক ও প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখবে।
- একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যা *দুদকের* টার্গেট নির্ধারণে এবং পরিকল্পনা অনুসারে কর্মসম্পাদনে ভূমিকা রাখবে।
- সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী (নেতৃবর্গ ও আইনজীবীগণসহ)-র জন্য আচরণ-বিধি প্রণয়ন করা।
- কার্যদক্ষতা পরিমাপের মাপকাঠি নির্ধারণ করা।
- গণমাধ্যম/গণযোগাযোগ নীতিমালা প্রণয়ন করা।

উক্ত কমিটি যে সকল প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতার শক্তিশালী কাঠামো আছে সেগুলিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করে দুর্নীতি দমন কমিশনের জন্য উপযুক্ত নীতি প্রণয়ন করতে পারে। যেমন: সেনাবাহিনী, দেশীয় ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা কৌশল।

দু'টি বিষয়ে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশকীয়: একটি হচ্ছে, কমিশনের কার্যাবলীর স্বচ্ছতা; অন্যটি হচ্ছে, বিচারাধীন কোন ব্যক্তির স্পর্শকাতর কোন তথ্য ফাঁস না করা, যা সেই ব্যক্তির মান-মর্যাদা অন্যায়ভাবে ক্ষুন্ন করে এবং অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং স্পর্শকাতর তথ্য গোপন রাখার জন্য নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। কোন বিশেষ ঘটনার বা ব্যক্তির তথ্য প্রকাশ করার পরিবর্তে সমষ্টিগতভাবে তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে।

মধ্যমেয়াদী পদক্ষেপ

দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন সরাসরি জাতীয় সংসদের স্পীকার এবং স্ট্যাণ্ডিং কমিটির কাছে পেশ করতে হবে।

স্পীকার এই বার্ষিক প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করবেন এবং প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য বিষয়াবলী নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা ও বিতর্ক নিশ্চিত করার জন্য সময় বরাদ্দ করবেন।

দুদকের একটি তথ্যবহুল ও ব্যবহারযোগ্য ওয়েবসাইট থাকতে হবে, যার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে কমিশন সম্পর্কে তথ্য বিতরণ করা হবে এবং কমিশনের স্বচ্ছতা বাড়বে।

কমিশনের অস্থায়ী কমিটির গৃহীত নীতিসমূহ কার্যকর ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি স্থায়ী পর্যবেক্ষণ কমিটি (oversight committee) গঠন করতে হবে। এই কমিটি সরাসরি এবং শুধুমাত্র কমিশনারদের কাছে জবাবদিহি থাকবেন।

কার্যকারিতা

দুর্নীতি দমন কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এর যথেষ্ট ক্ষমতা থাকতে হবে এবং তাকে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ করার জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রতি বছর কমিশনকে তার সফলতা বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তা জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে। এই বিশ্লেষণের জন্য কমিশন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদের কর্মকাণ্ড সাজাতে পারে, অগ্রগতি ও সীমাবদ্ধতা প্রদর্শনের জন্য নক্শা ব্যবহার করতে পারে এবং ভবিষ্যতে যে সকল ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করতে পারে। কিন্তু বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যকরতা নিরুপণের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই।

সুপারিশ: দুর্নীতি দমন কমিশন তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। কমিশন মামলার বিচার কাজকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গুরুত্ব দিতে পারে, যেহেতু এই ক্ষেত্রের সাফল্য প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করবে। সাফল্যের সীমারেখা কমিশনের কার্যকরতা নির্দেশ করবে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আরও উন্নতি করতে হবে তা স্পষ্ট করবে।

স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন স্পষ্টভাবে দুর্নীতিকে সংজ্ঞায়িত করবে এবং কোন ধরনের দুর্নীতি কমিশনের এখ্তিয়ারভুক্ত হবে তা উল্লেখ করবে।

দুর্নীতির জন্য কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আছে এবং এ কারণে দুর্নীতি করা ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদজনক—এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। দুর্নীতি যে কত ভয়ঙ্কর সে বিষয়ে জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য এনজিও, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। জনগণকে দুর্নীতি বিষয়ক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে দুর্নীতি-বিরোধী প্রবণতা সৃষ্টি হবে। সুতরাং রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলেও জনগণের মধ্যে দুর্নীতি প্রতিহত করার শক্তি জাগ্রত হবে। জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য নিচের প্রতিষ্ঠান/কৌশলসমূহ ব্যবহার করা যেতে পারে:

বিদ্যালয়	:	পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে।
ওয়েবসাইট	:	সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্পদ বিবরণী কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার মাধ্যমে (দক্ষিণ আফ্রিকা ও মেক্সিকোর অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে)।
ব্যবসায়ী গোষ্ঠী	:	শিল্প ও বণিক সমিতিসমূহকে সম্পৃক্ত করে।
তথ্যব্যাংক	:	দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পুলিশ, এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যারা দুর্নীতির অপরাধ তদন্ত কাজে নিয়োজিত, তাদের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে।
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	:	দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা ও জনমত তৈরীতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে কাজে লাগিয়ে।

দুর্নীতি সংক্রান্ত কেস স্টাডি তৈরী করা, ব্যবস্থাপনার ত্রুটি-বিচ্যুতি জানা এবং কোথায় ও কিভাবে দুর্নীতির জন্ম হয় তা অনুসন্ধান করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কমিশনের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেমন: শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, এটর্নী জেনারেলের অফিস ইত্যাদি।

দুর্নীতির অপরাধে কঠোর শাস্তিবিধান করতে হবে। বিপরীতক্রমে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে যারা কাজ করছেন তাদেরকে সফলতার জন্য জন-স্বীকৃতিসহ উৎসাহব্যঞ্জকভাবে পুরস্কৃত করতে হবে।

দুর্নীতি দমন কাজে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর নয়, বরং উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর কৌশল অবলম্বন করতে হবে। ছোট দুর্নীতি (petty corruption) দেখার আগে বড় বড় দুর্নীতির (grand corruption) দিকে কমিশনকে নজর দিতে হবে।

তদন্ত কাজে আইনগত বাধাসমূহ দূর করতে এ বিষয়ে কমিশনের কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মধ্যমেয়াদী পদক্ষেপ

কমিশনের কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করা এবং নিয়মিতভাবে আইন-কানুন পর্যালোচনা করার জন্য নিরপেক্ষ কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করা।

কমিশনের তৎপরতা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণের ধারণা যাচাই

করতে প্রতি বছর নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর একটি জরিপ পরিচালনা করা: বাংলাদেশে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ধারণা, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা, তদন্ত কাজে কমিশনের ক্ষমতা ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে ধারণা।

দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ

বড় ধরনের দুর্নীতির উপর গুরুত্ব বেশি দিলেও, ছোট দুর্নীতির মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ এবং লোকবল সম্পৃক্ত করা, কারণ নিম্নপর্যায়ের দুর্নীতিই সাধারণ মানুষের ভোগান্তির অন্যতম কারণ।

জন-সচেতনতা বাড়ানোর তৎপরতা অব্যাহত রাখা।

দক্ষতা

দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্য-সম্পাদনের দক্ষতা পরিমাপ ও মূল্যায়নের জন্য এর নিজস্ব একটি সমন্বিত মাপকাঠি থাকা প্রয়োজন। পুরনো মামলা নিষ্পত্তির হার, নাগরিকদের অভিযোগ গ্রহণ, যাচাই-বাছাই ও নতুন মামলার জন্য সময় নির্ধারণ, মামলা দায়েরের হার এবং মামলায় সাফল্যের হারের দ্বারা এই মাপকাঠি নিরূপিত হতে পারে।

সুপারিশ: দুর্নীতি দমনে দক্ষতার উচ্চমান নিশ্চিত করতে কর্মকাণ্ড এবং নীতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অনিষ্পন্ন মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্য-সম্পাদনের সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।

স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ

বিচারাধীন প্রতিটি মামলায় কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করতে হবে—এ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

প্রয়োজনে, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক/সিনিয়র আইনজীবীদের সহায়তা নিয়ে আনুপাতিক হারে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর বিচারাধীন মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে মামলা নিষ্পত্তির যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে তা সংশোধন করে একটি যুক্তিসঙ্গত সময় নির্ধারণ এবং নির্ধারিত সময়ে একটি মামলার নিষ্পত্তি না হলে করণীয় বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। অতি দ্রুত বিচার কাজ অথবা স্বাভাবিক বিচারের নীতির সঙ্গে আপোষ করা হলে, কোনো এক পর্যায়ে উচ্চ আদালত এইসব বিচারকে আইনবহির্ভূত ঘোষণা করতে পারে।

মধ্যমেয়াদী ব্যবস্থা

সিঙ্গাপুরের সিপিআইবি-র অনুসরণে দক্ষতা অর্জনের কতগুলো সীমারেখা নির্ধারণ করা: তদন্তকাজ শেষ করার সময়সীমা, প্রতি বছর মামলা নিষ্পত্তির হার, মামলার বিচারের হার, এবং আদালতে শাস্তি-বিধানের হার।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

দুর্নীতি দমনে নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশন এ উদ্দেশ্যে গঠিত অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে দুর্নীতি রোধের জন্য দেশব্যাপী একটি সু-সমন্বিত এবং সামগ্রিক কর্মসূচি নিতে পারে।

স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ

প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কমিশনের নিজস্ব আইনজীবী নিয়োগ করা প্রয়োজন। দক্ষ আইনজীবীদের দ্বারা কমিশনের মামলা পরিচালনার স্বার্থে আইনজীবীদেরকে প্রতিযোগিতামূলক বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া আবশ্যক। দুর্নীতি দমন কমিশন ও এটর্নী জেনারেলের দপ্তরের মধ্যে একটি উপযুক্ত সমন্বয়-পন্থা প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ঘোষিত লক্ষ্যে দুর্নীতি বরদাশ্ত না করার নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

মধ্যমেয়াদী পদক্ষেপ

অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনে একটি সেল খোলা দরকার। দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার বিচার প্রক্রিয়া তদারকি করা এবং এ প্রক্রিয়ার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার লক্ষ্যে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ

কমিশনের কাজের যেসব ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন (যেমন: তদন্ত) সেসব ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়াতে হবে। সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ছোট দুর্নীতি মোকাবেলার জন্য একটি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি দমন ইউনিট গঠন করতে হবে। এই ইউনিটসমূহ তাদের বিস্তারিত কর্ম-তৎপরতার উল্লেখ করে কমিশনের কাছে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে রিপোর্ট পেশ করবে। সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে দুর্নীতির ঘটনা তদন্ত করার জন্য একটি র‌্যাপিড এ্যাকশন গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জাতীয় সততা কৌশল (National Integrity Strategy) যা এখন প্রস্তুতির পর্যায়ে রয়েছে, তা সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বাস্তবায়ন করতে হবে। এর ফলে সরকারের অভ্যন্তরীণ নেতৃত্ব উৎসাহিত হবে।

উপসংহার

দুর্নীতি দমন কমিশনের সফলতা নির্ভর করবে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের উপর, কারণ শুধুমাত্র এই পরিবেশেই কমিশনকে পর্যাপ্ত সম্পদ দিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে। অভ্যন্তরীণ সহায়তা এবং যোগ্য নেতৃত্ব বর্তমান থাকলেও সরকারের জোরালো সমর্থন ছাড়া *দুদকের* পক্ষে তার উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব নয়। কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার একটি প্রধান উপায় হবে এর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, এবং তা হবে পর্যবেক্ষণ কৌশলের দ্বারা জবাবদিহিতাপূর্ণ। দক্ষতার একটি উচ্চমান বজায় রাখার স্বার্থে দুর্নীতি দমন কমিশনকে অবশ্যই আইনগত নির্দেশাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে হবে এবং কাজে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। সর্বোপরি, দুর্নীতির অপরাধ কার্যকরভাবে তদন্ত এবং মামলা রুজু ও পরিচালনা করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনকে যথাযথ ক্ষমতা দিতে হবে।

* আইজিএস -এর পলিসি নোটসমূহ www.igs-bracu.ac.bd-এ পাওয়া যাবে।

বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ এবং নেদারল্যান্ডস্ সরকারের সহায়তায় এই পলিসি নোট তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। জবাবদিহিতামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর যে নীতিমালা সিরিজ তৈরীর পরিকল্পনা করা হয়েছে—এর মধ্যে এ'টিই প্রথম।

পাদটীকা

১। এই প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত বিশ্লেষণ জানতে হলে, দেখুন: Institute of Governance Studies, Institutions of Accountability: The Anti-Corruption Commission (2007), (www.igs-bracu.ac.bd).

২। এই কর্মশালাটি ১৩-১৪ মে, ২০০৭ -এ অনুষ্ঠিত হয়। এতে দুর্নীতি দমন কমিশন, বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, সরকারের অন্যান্য বিভাগ, নাগরিক সমাজ, দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞগণ দুর্নীতি দমন কমিশনের সম্ভাব্য নীতি নিয়ে আলোচনা করেন। কর্মশালার অংশগ্রহণকারীদের প্রস্তুতির জন্য *আইজিএস*-এর সংশ্লিষ্ট টীম একটি পটভূমিকাপত্র (background paper) প্রস্তুত করে, যাতে এর ইতিহাস, চলতি ঘটনাপঞ্জী এবং এর চ্যালেঞ্জসমূহ উল্লেখ করা হয়। পটভূমিকাপত্রে বাংলাদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক পরিবর্তনসমূহ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের উপর এর প্রভাব, পরিবর্তিত কমিশন ও বিশেষ ক্ষমতা আইনের উপর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি, অন্যান্য দেশের দুর্নীতি দমন সংস্থাসমূহের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি বৃহত্তর তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন এর উপর আলোচনা করা হয়েছে।

আইজিএস টীম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, সম্ভাব্য একটি উত্তম নীতি প্রণয়ন করার জন্য আইনগত কাঠামো, স্বাধীনতার পরিমাণ, দেশের শাসনাবস্থা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছাসহ অন্যান্য দুর্নীতি দমন সংস্থাসমূহের সম্পদের প্রাপ্যতা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। *আইজিএস* টীম আরও মনে করে যে, দুর্নীতি দমন কমিশন তার কাজের দ্বারা যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ করতে পেরেছে -এর দ্বারাই কমিশনের সাফল্য বিচার করা সঙ্গত।

৩। বলা প্রয়োজন যে, আরও বিবেচ্য বিষয় রয়েছে, কিন্তু সুপারিশমালা উল্লিখিত ৪টি বিষয়ের উপরই আলোকপাত করবে।

৪। অনেক ব্যক্তি এবং সংস্থার পরামর্শ গ্রহণ করা হলেও *আইজিএস* টীম এই সুপারিশমালার অবলোকন ও সুপারিশসমূহের সকল দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করছে।

৫। করাপ্ট প্র্যাক্টিসেস্ ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (সিপিআইবি) সিঙ্গাপুরে দুর্নীতি কমাতে শীর্ষ ভূমিকা পালন করেছে। সিপিআইবি দলগত এবং ফল-ভিত্তিক কাজ, কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও সাহসিকতা, নিরপেক্ষতা ও সৃজনশীলতা এবং লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি একাগ্রতার মৌলনীতি ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী।

ইনস্টিটিউট অফ গভর্নেন্স স্টাডিজ (আইজিএস) ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও পাঠদান প্রতিষ্ঠান।

ইনস্টিটিউট অফ গভর্নেন্স স্টাডিজ-এর মতে, যেসব প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ তার নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সকলের বা সাধারণের কাজ সমাধা করে – তার সম্মিলিত রূপই গভর্নেন্স।

উদ্দেশ্য

এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য – বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ায় কার্যকর, স্বচ্ছ, জবাবদিহি, ন্যায়পর, এবং নাগরিক-বান্ধব সরকারের অগ্রসরতায় সহায়তা করা।

এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আইজিএস শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ায় গভর্নেন্সের শক্তি ও দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। আইজিএস গভর্নেন্সের ভিত্ উন্নত ও মজবুত করার পন্থা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে বাংলাদেশে এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে।

কার্যক্রম

উন্নততর শাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে আইজিএস–এ বর্তমানে গবেষণার পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য স্নাতকোত্তর শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। ভবিষ্যতে এ শিক্ষা কার্যক্রমে শিল্পখাত, এনজিও, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের নির্বাহীদের আকৃষ্ট করার পরিকল্পনা রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- গভর্নেন্স ও উন্নয়ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী
- বাংলদেশে গভর্নেন্স পরিস্থিতি বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ
- বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংস্কার সুপারিশমালা প্রণয়ন ও প্রকাশ
- নির্বাহী প্রশিক্ষণ